সেলিম রেজা নিউটন
কুমিল্লা সংস্কৃতি উৎসব ২০১৪

শাহবাগের স্বাধীনতাই শাহবাগের পথ

ভূমিকার পরিবর্তে শাহবাগের কবিতা: অভিনন্দন, সবাইকে

সমবেত সুধীমণ্ডলী,
আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।
কেউ এই সভা ছেড়ে যাবেন না।
বিষয়টা জরুরী।
তবে ঘাবড়াবেন না।
মূলত আপনাদের অভিনন্দন জানাতে এসেছি।

এই যে অধ্যাপক,
আপনার চলে যাওয়ার বিজ্ঞ ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে
শোনার অভ্যাস আপনার ধাঁতে নেই।
দাঁড়ান।
গত বছর আপনাকে যে পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছিল
সেটা ঠিকই ছিল।

আত্মঘাতী পরিস্থিতি, বণিক বার্তা ১ আমার অরাজ আমার স্বরাজ, সোনার দেশ

কিন্তু কারণটা ছিল ভুল।
ওটা ছিল চৌর্যবৃত্তিতে আপনার সর্বোৎকৃষ্ট প্রশিক্ষণের স্বীকৃতি।
জাতিকে এক ঝাঁক দক্ষ চোর উপহার দেওয়ার জন্য আপনাকে অভিনন্দন!
(দেশ তাঁদের বিদ্যার সফল প্রয়োগে সন্তুষ্ট।)

এই যে কবি,
অন্যমনস্কতার ভান করে কোথায় চলে যাচ্ছেন?
আপনিও দাঁড়ান।
নৈরাশ্য আর নারীর শরীর নিয়ে নিরন্তর চিন্তা করে
আপনার মনোজগতের উপর দিয়ে বেশ ধকল যাচ্ছে নিশ্চয়ই।
আপনার 'গাধার আত্নকথন' কবিতাটা কিন্তু বেশ ভালই হয়েছে।
আপনার নতুন উদ্ভাবিত কাব্যতত্ত্ব দিয়ে
কুকুরের প্রভুভক্তিকেও হার মানিয়েছেন বলে
মানবকুলের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন!

এই যে চিকিৎসক,
আপনিও দাঁড়ান।
ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আপনার রোগী দেখতে যাওয়ার দরকার নেই।
আপনি না গেলে বরং রোগীটা হয়ত বেঁচে যাবে।
আপনার কুশলী হাত দেখে মনে হচ্ছে
আপনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্যে
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন!

মান্যবর শিল্পপতি,
আপনি আঙ্গুল চুষছেন কেন? (শোষণে বিরতি সম্ভব?)
আপনি কি ক্ষুধার্ত?
তবুও দাঁড়ান।
আপনার বিরহে কোন শ্রমিক নিশ্চয়ই অনশনে যাবেন না।
দিন-রাত অমানুষিক পরিশ্রম করে আপনি দেশের সবকিছুকে (এমনকি দেশকেও)
যে রপ্তানিযোগ্য করে তুলেছেন সে জন্য
রপ্তানী-উন্নয়ন ব্যুরোর পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন!

মাননীয় রাষ্ট্রপতি,

অধৈর্য হবেন না।
আরেকটু দাঁড়ান।
আপনি দাঁড়িয়ে থাকলে বরং দেশের লাভ।
দেশ উদ্ধারের জন্য গত বছর ইউ.এন.ও. আপনাকে যে পুরস্কার দিয়েছিল
ওটা ঠিকই ছিল তবে শব্দ ব্যবহারে সামান্য গোলযোগ ছিল।
'উজাড়' বলতে গিয়ে ওরা 'উদ্ধার' বলে ফেলেছিল।
সাম্রাজ্যবাদের খেদমতে দেশকে উজাড় করে দেওয়ার জন্যে
আপনার উদারতাকে অভিনন্দন !

একযোগে সবাইকে আবারও অভিনন্দন।
সবাই একটা করতালি।

জাহিদ আকতার। **অভিনন্দন, সবাইকে**। ১১ই মার্চ ২০১৩

অসংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ

এই রচনায় আমি যতবার আমি 'শাহবাগ' বলব ততবারই বোঝাব শাহবাগ-গণসমাবেশকে, ততবারই বোঝাব দেশব্যাপী বহুবিচিত্র মানুষের গণজাগরণ-আন্দোলনকে, ততবারই বোঝাব ঢাকার শাহবাগের খোদ শাহবাগ-আন্দোলনটাকে — একবারও বোঝাব না গুটিকয় ব্যক্তির স্বঘোষিত কেন্দ্রীয় গণজাগরণ-মঞ্চকে। এই রচনায় আমি যতবার আমি 'গণজাগরণ-মঞ্চ' বলব ততবারই বোঝাব ঢাকার শাহবাগে গঠিত 'কেন্দ্রীয়' গণজাগরণ-মঞ্চ-কমিটিকে। কেন এই সতর্কতা তা নিয়ে কথা হবে এ রচনার শেষের দিকে।

শাহবাগ-আন্দোলনের কাছে বাংলা-বসন্তের প্রত্যাশা

ঘোরতর শীতকালে শাহবাগের সূত্রপাত বাংলা-বসন্তের আবাহন দিয়ে। স্বাধীনতা দিয়ে শুরু হয়েছিল শাহবাগের পথ — শাহবাগের হাঁটা। আপাতত শেষ হয়েছে — থমকে গেছে বলাই ভালো — অন্ধত্ব দিয়ে। ঘোরতর মতবিদ্বেষ দিয়ে। চিন্তাচর্চা ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিপুল গণপরিসরে এতটা অন্ধত্বের পাইকারি প্রদর্শনী আগে আমরা দেখি নি তেমন। সামান্য মতপার্থক্য, মতদ্বৈততা বা মতবৈচিত্র্যকে চোখের পলকে দেওয়া হচ্ছে উপাধি: রাজাকার, পাকি, দালাল, মৌলবাদী, শাহবাগী, নাস্তিক, হেফাজতী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী ইত্যাদি প্রভৃতি।

এই ঘোর অন্ধ-বিদ্বেষের আড়ালে ক্রমাগতভাবে রাক্ষস হয়ে উঠছে রাষ্ট্র তার

সরকারী ও বিরোধী-বেসরকারী শাখার ক্রমবর্ধমান হিংস্রতার মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্র, তার সরকারী দল, তার বিরোধী দল, এইসব দলের দলীয় ক্যাডারবাহিনী এবং সর্বোপরি তার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহের দারুণ আক্রমণাত্মক বাহিনীসমূহের গণতান্ত্রিক চেতনাবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠছে: রাষ্ট্র তো যুদ্ধাপরাধ সামলাবে, কিন্তু এই সব রাজাকারের বিচার-রায়-বাস্তবায়নের পর এই রাক্ষসপ্রবণ আগ্রাসী রাষ্ট্রকাঠামোটাকে সামলাবে কে?

এক যুদ্ধাপরাধের বিচার করতে গিয়ে হুমকির মুখে পড়েছে নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান ও আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশ। সামনের বাংলাদেশ কোন পথে যাবে? সামনের দিনে এই মহাজোট সরকার ও তার অন্তর্গত পার্টিসমূহের সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে কি কার্যকর আর কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক দল-শক্তি-সংস্থার উন্মেষ ঘটার আশা আছে? সে ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের উদার, বহুদলীয়, বহুমতের সমাজগড়নটাকে বাঁচানোর ও বিকশিত করার কর্তব্য হাতে তুলে নেবে কারা? সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনায় কি তরুণ-যুবাদের ভূমিকার রাখার কোনো উপায় কি আর অবশিষ্ট থাকবে? গত শীতের জোয়ারভাসানো আন্দোলনের পরের এই ভাটার শীতে এসে সবচেয়ে বেশি করে অনুভূত হচ্ছে প্রাণচঞ্চল শাহবাগ-জাগরণের অভাব যা নাকি পারত যুদ্ধাপরাধের বিচার-মামলা পেরিয়ে গিয়ে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার পথ দেখাতে।

এই প্রত্যাশার উৎস আছে গেল-শীতের শাহবাগ-জাগরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে। এই বৈশিষ্ট্যের যথাযথ পর্যালোচনা থেকে বোঝা যেতে পারে শাহবাগ ছেড়ে কেন চলে গেল সমবেত সমুদ্র-জনতা। এ পর্যালোচনা থেকেই ইশারা পাওয়া যেতে পারে কীভাবে আমরা আমাদের এই বিকাশমান সমাজটায় বহু কাঙ্ক্ষিত বর্ষাবসন্তের ঐতিহাসিক নবায়ন ঘটাতে পারতে পারি, এবং কীভাবে সে কাজে হতে পারি ব্যর্থ।

শাহবাগ-আন্দোলন কি নিতান্তই ফাঁসির আন্দোলন?

নতুন ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার দীর্ঘলালিত স্বপ্নই এ আন্দোলনের প্রাণের স্পৃহা। এ আন্দোলন অনাগত বাংলা-বসন্তের আগাম গণইশতেহার। এ আন্দোলন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অসমাপ্ত কর্তব্য সমাধা করার গণআকাঙ্ক্ষার অভিপ্রকাশ। এ আন্দোলন বৈষম্য-বঞ্চনা-বলপ্রয়োগহীন সুস্থ-সুন্দর-উন্নত বাংলাদেশের অর্জনের লক্ষ্যে তরুণ-ছাত্র-যুবাদের লক্ষ্য-অভিসারী গণআন্দোলন। একাত্তরের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই ছিল এ আন্দোলনের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

বহুবর্ণিল এ আন্দোলনের রংধনু থেকে মিডিয়া ও স্বার্থবাদী মহল শুধু ফাঁসি-চাই-ধ্বনিটাকেই সবচেয়ে বড় করে সামনে এনেছে। এর মূল গণআকাঙ্ক্ষা ও গণচরিত্রকে আড়াল করে রেখেছে। সেই আড়ালকে উন্মোচন করাই আমাদের

এখনকার প্রধান কর্তব্য। এই কর্তব্য সমাধা করতে পারলে নতুন করে নবপর্যায়ে জেগে উঠবে শাহবাগ-আন্দোলন।

আসলে নতুন চেতনার নব-উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে শাহবাগ-আন্দোলন। নতুন ভাষা, নতুন প্রকাশভঙ্গি, নতুন আকাঙ্ক্ষার বিপুল বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিপ্রকাশ এ আন্দোলন। এ একেবারে নতুন আওয়াজ। শাহবাগ-আন্দোলন দেখিয়েছে 'ইমাজিনেইশন আনবাউন্ড'-এর এক পশলা বর্ষণ, ঘটিয়েছে নবতর কল্পনাপ্রতিভার অবাধ স্ফূরণ। এ আন্দোলনের প্রধান একটা চরিত্র এর বহুস্বর ও বহুকেন্দ্র। এ আন্দোলন রাস্তার গণতন্ত্রের সত্যিকারের দৃষ্টান্ত। এ আন্দোলন তারুণ্যের, যদিও বয়স্করা এর অংশ। এ আন্দোলন নতুনের। এ আন্দোলন নতুন প্রজন্মের। মুখস্ত আন্দোলন এ নয়। এ আন্দোলন প্রথাবিরোধী। বাংলাদেশের চর্বিতচর্বণ পার্টি-পলিটিক্সের দিশাহারা বৃত্তের একেবারে বাইরের এ আন্দোলন আমাদের বহু-কাঙ্ক্ষিত নতুন ধারার আন্দোলনের সত্যিকারের গণনমুনা। অন্য দিকে, শাহবাগ-আন্দোলন হলো দলীয় রাজনৈতিক বৃত্ত থেকে উদ্ধার করে মুক্তিযুদ্ধের ওপর জনমালিকানা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ দিক থেকে দেখলে এ আন্দোলন অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধের অমিমাংসিত প্রশ্নগুলোকে ফয়সালার করার জন্য স্রেফ সরকার এবং আদালতের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে নি, নিজেরা আলাপ-আলোচনা -তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে সেগুলোর মিমাংসা ঘটানোর কাজে এগিয়ে গেছে বহু দূর।

সরকার ও রাজনৈতিক দলের প্রতি ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সূত্রে প্রাপ্ত অনাস্থা এবং অবিশ্বাস থেকে সূত্রপাত ঘটেছিল এ আন্দোলনের। এ আন্দোলন দলীয় রাজনৈতিক চরিত্রকে সযত্নে পরিহার করতে চেয়েছে আগাগোড়া। নতুন ধারার রাজনীতির সূচনা ঘটাতে চেয়েছে এই আন্দোলন। দলীয় রাজনীতির নোংরামি, গণবিচ্ছিন্নতা, কাদা-ছোঁড়াছুড়ি ও সংকীর্ণতাকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছে এই আন্দোলন। সবাই এসব জানেন। জার্মান বেতার 'ডয়চে ভেলে'ও খেয়াল করেছিল তা: 'শাহবাগের আন্দোলনকে কিছুতেই রাজনীতিকরণ করতে দেবে না প্রতিবাদকারীরা। গত কয়েকদিনে রাজনীতিবিদরা সেখানে গিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। অবস্থানকারীরা তাদের বক্তব্য শুনতে রাজি নন।'* এঁদেরই আরেকটা প্রতিবেদনে এই আন্দোলনের রাজনৈতিক দল বহির্ভূত চরিত্রটা ফুটে উঠেছে ভালোভাবে:

''চারদিকে শুধুই মানুষ আর মানুষ, শত শত মানুষ, যাঁরা বিভিন্ন জায়গা থেকে

---

* প্রতিবেদন: সঞ্জীব বর্মন / আরাফাতুল ইসলাম। সম্পাদনা: দেবারতি গুহ। তারিখ ০৮-ই ফেব্রুয়ারি ২০১৩। www.dw.de/overlay_media/প্রজন্ম-চত্বরে-জনসমুদ্র /g-১৬৫৮৩১২১।

এসেছেন....ঢাকার বাইরে থেকে মানুষরা এসে আমাদের এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন।'' পুরো আন্দোলনটা কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচির রূপ ধারণ করতে চলেছে কিনা, এ প্রশ্নের জবাবে আবু সুফিয়ান বললেন, প্রতিবাদ সমাবেশে সব বয়সের, সব পেশার মানুষরা আছেন। ''এই সমাবেশ থেকে **রাজনৈতিক কোনো চিত্র আঁকাটা ঠিক হবে না**....এই আন্দোলন দেশের আপামর জনসাধারণের....যেখানে দেশের সব শ্রেণির মানুষ আছে....এটাকে **রাজনীতিকরণ বা রাজনীতির 'প্লট' দেওয়াটা ঠিক হবে না**,'' বললেন আবু সুফিয়ান।

এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা কারণ বাংলাদেশের মানুষ প্রধান দুই বিরোধী দল ছাড়া কিছু চিন্তাই করতে পারে না। তাদের **রাজনৈতিক 'অ্যাজেন্ডা' বাদে বাংলাদেশের মানুষ অতীতে কিছুই করেনি, কিছুই চিন্তা করতে পারত না**।'' ('প্রজন্ম চত্বরে' 'বাংলাদেশের বসন্ত': [ব্লগার] আবু সুফিয়ান। সাক্ষাৎকার: অরুণ শঙ্কর চৌধুরী, সম্পাদনা: দেবারতি গুহ। ডয়কে ভেলে। তারিখ ০৭.০২.২০১৩। http://www.dw.de/বাংলাদেশের-বসন্ত/a-১৬৫৮০০৭০। পা:র্মালিংক: http://dw.de/p/১৭ZEU। মোটা হরফ বর্তমান প্রাবন্ধিকের।)

তবু এই আন্দোলনটাকে দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন অনেকেই – একে সমর্থন করে, সাহায্য-সহযোগিতা-পাহারা যুগিয়ে, এর বিরোধীতা করে, এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে, এর ওপর সূক্ষ্ণ ও স্থূল চাপ প্রয়োগ করে, এবং সর্বোপরি আন্দোলনটাকে হাইজ্যাক করার চেষ্টা করার মধ্য দিয়ে। সরকার, বিরোধীদল, যুদ্ধাপরাধী দল ও ক্যাম্পগুলো কেউই এই কাজে পিছিয়ে থাকেন নি। ব্লগারদের দুইটা ব্যানার – 'ব্লগার অ্যান্ড অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্ক' এবং 'জাতীয় স্বার্থে ব্লগার অনলাইন একটিভিস্ট ফোরাম' – যথাক্রমে আওয়ামী লীগ এবং বর্তমানে আওয়ামী মহাজোট বহির্ভূত বলশেভিক-বাম ধারার প্রচ্ছন্ন প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এই দুই ধারার সাথে সমবেত হয়েছে ছাত্রলীগ এবং ছাত্রইউনিয়ন-ছাত্রমৈত্রী প্রভৃতি সংগঠন। শাহবাগে নিজেদের উপস্থিতি এবং গণজাগরণ-মঞ্চের সিদ্ধান্তগ্রহণ-প্রক্রিয়াকে যথাসম্ভব প্রভাবিত করার দিকে মনোনিবেশ করেছেন এঁরা সবাই। কিন্তু সরকার, ছাত্রলীগ, এবং (অন্তত যুদ্ধাপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে) সরকারের অন্যতম থিংকট্যাংক 'একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি' যেভাবে গণজাগরণ-মঞ্চ পকেটস্থ করার মধ্য দিয়ে শাহবাগ-আন্দোলনকে সরকারের 'শাহবাগ-ফ্রন্ট' বানানোর কাজে মনোনিবেশ করেছেন তা এই আন্দোলনকে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ক্রমাগতভাবে গণজারণ-মঞ্চকে নিয়ে খেলেছে সরকার। নানাভাবে। তোয়াজ করেছে। ধমক দিয়েছে। সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে। ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দার শোভন খুন

হবার পর তাঁর বাসায় গিয়ে এক ধরণের আচরণ, আবার হেফাজতে ইসলাম ও আমার দেশের প্রচারণার চাপে তরুণ ব্লগারদেরকে গ্রেপ্তার করার মতো আচরণ। ক্ষমতায় টিকে থাকার আন্তরিক কৌশল-বোধ ছাড়া বিশেষ কোনো নীতিবোধের নমুনা সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। সরকার তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বারবার রাশ টেনে ধরার চেষ্টা করেছে এই আন্দোলনের। ছাত্রলীগকে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকটু চেষ্টা, স্লোগান-আইকন লাকী আক্তারকে মঞ্চের ওপরই মারা, অন্যদেরকে চাপের ওপর রাখা – কিছুই বাদ যায় নি প্রায়। সর্বোপরি ৬ই এপ্রিলে এসে হেফাজতে ইসলামের ব্যানারে সংঘটিত সহিংসতা দমনের সাথে 'ভারসাম্যের পলিটিক্স' খেলতে গিয়ে তাঁরা শহীদ জননী জাহানারা ইমামের প্রতিকৃতি সরিয়ে ফেলেছেন, উচ্ছেদ করেছেন গণজাগরণ-মঞ্চকে শাহবাগের জমি থেকে, তাতে করে তাঁদের রাজকূট-নীতি এবং কূট-রাজনীতির চেহারাটাই ফুটে উঠেছে। এইসব নানা কিছু করে মঞ্চটাকেই পকেটে ভরা গেছে শুধু, কিন্তু সেটাও আমজনতাকে বাড়ি ফেরত পাঠানোর বিনিময়ে।

বাংলা পরীক্ষার দিন আরবি পরীক্ষার আলাপ তোলার সেই সংকীর্ণ আপত্তির কথা আমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই। শাহবাগ-আন্দোলনকে যাঁরা স্কুল-কলেজের কৃত্রিম পরীক্ষার সাথে তুলনা করে আন্দোলনের চোখটার বড় ওঠার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা আজকে স্বপ্নের সেই শাহবাগ-গণসমাবেশকে আর ডাইনেবাঁয়ে দেখতে পাচ্ছেন না বলে আফসোস করছেন মনে মনে। তাঁদের ডাইনেবাঁয়ে এখন অধিপতি ধারার কর্পোরেট-মিডিয়া, সরকারী পাহারা আর রাজনৈতিক মুরুব্বিরা ছাড়া কেউ নেই বললেই চলে।

দেশব্যাপী গণজাগরণ-আন্দোলনের মঞ্চবৈচিত্র্য বলে দেয় শাহবাগ-আন্দোলন আগে-থেকে-ছক-কষা সংকীর্ণ ঘোষণা-কর্মসূচির কোনো একপথু এন্টারপ্রাইজ ছিল না। এ ছিল সমাজের সর্বস্তরের সর্বধারার মানুষের বৈচিত্র্যময় সমাবেশ। এ ছিল আরণ্যক বসন্তের আভাস। বসন্ত শুধু ইউক্যালিপটাসে হয়। বিরাট বিরাট লোহার কাঁচি দিয়ে মাথাছাঁটা পাতাবাহারের সৈনিকসম সমরূপতার বিন্যাস দিয়ে বানানো বাগান হয় বড় জোর, বসন্ত হয় না। আসছে বাংলা-বসন্তের আগাম কোকিল হয়ে এসেছিল যে শাহবাগ তার সমাজ-অরণ্যে ছিল নানা মতের নানা পথের – এমনকি অপথ-বিপথের – নানা ধারার মানুষ। এ হয়েছিল জনসমুদ্র। সত্যিকারের জনসমুদ্র। 'জনসমুদ্র' এতদিন আমরা বইয়েই পড়েছি, বাস্তবে দেখি নি। কোনো দিন না। শাহবাগে সে প্রথম দেখা দিল – সমাজসমুদ্র।

শাহবাগ-আন্দোলনের পরীক্ষাটা ছিল আসলে সমাজপাঠের পরীক্ষা। জীবনের পরীক্ষা। কৃত্রিম ক্লাসরুমের মুখস্ত পরীক্ষা নয়, 'পৃথিবীর পাঠশালা'র বিনা-কোর্সের বিনা-সিলেবাসের পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় আমরা ডাহা ফেল করেছি। আমাদের প্রস্তুতি

ছিল না। পুকুরে গোসল করা যাঁদের আজীবনের অভ্যাস, হঠাৎ সমুদ্র দেখলে তো তাঁরা ভড়কে যাবেনই। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার পুকুর বলতে এর পুকুর ওর পুকুর ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। এমনকি বর্ষার উপচে পড়া পুকুরের ভেসে যাওয়া মাছ নিয়েও এমনকি কাড়াকাড়ি করাটা যাঁদের স্বভাব তাঁরা শাহ্‌বাগ-সমুদ্রের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি-গোষ্ঠী-মালিকানা বজায় রাখার কায়দাকানুনের ওপরই জোর দিলেন। এই পক্ষও। ঐ পক্ষও। গণমালিকানা বা সামাজিক মালিকানার দৃষ্টিভঙ্গি কারোরই আছে বলে মনে হলো না। পরিণামে থমকে গেল শাহ্‌বাগ।

গণজাগরণ মঞ্চ, গণজাগরণ-আন্দোলন, এবং নবতর সংগঠনপ্রণালীর প্রয়োজনীয়তা

এ রচনার শুরুতেই বলেছিলাম আমি ‘শাহ্‌বাগ’ বলতে বুঝি শাহ্‌বাগ-গণসমাবেশকে, দেশব্যাপী অজস্র মানুষের গণজাগরণ-আন্দোলনকে, ঢাকার শাহ্‌বাগের শাহ্‌বাগ-আন্দোলনটাকে। বলছিলাম শাহ্‌বাগ বলতে আমি — গণজাগরণ -মঞ্চ-কমিটিকে বুঝি না। আমার কাছে, আরও অনেকের মতোই, গণজাগরণ মঞ্চ এক জিনিস, আর গণজাগরণ-আন্দোলন অন্য জিনিস। ভেঙ্গে বলা যাক।

‘কেন্দ্রীয়’ গণজাগরণ-মঞ্চ-কমিটি আর সারা দেশের জেলা-উপজেলা-শহর পর্যায়ে ও সারা বিশ্বের নানান জায়গায় ছড়িয়েছিটিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা গণজাগরণ-মঞ্চগুলোর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো এক নয়। কেন্দ্রীয় গণজাগরণ-মঞ্চ-কমিটি একেবারেই আলাদা ধরণের একটা সত্তা। এই কেন্দ্রীয় কমিটির হুকুমে কিন্তু পরিচালিত হয় না সারা দেশের ও সারা বিশ্বের গণজাগরণ-মঞ্চগুলো। প্রকৃতপক্ষে শাহ্‌বাগ-আন্দোলনের কোনো কেন্দ্র-প্রান্ত বা ঊর্ধতন-নিম্নতন কোনো কর্তৃত্বতান্ত্রিক কঠোর নাই। একেবারেই নাই। সম্পর্কটা স্বতঃস্ফূর্ত ধরণের, স্বেচ্ছা-সম্মতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা। কোনো বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে দাঁড়ানো সংগঠন-কাঠামো এটা নয়। শুরু থেকেই এটা কারো চোখ এড়ায় নি যে ‘দেশ কাঁপানো এই গণজাগরণের পেছনে একক কোনো নেতৃত্ব নেই। আত্মার আহ্বানে মিছিলে আসা, বিক্ষোভে জমায়েত প্রতিটি কণ্ঠস্বর হয়ে উঠছে আন্দোলনের নেতা।’ (চেতনার আলো জ্বালানো সেই তরুণরা কালের কণ্ঠ, ঢাকা, রবিবার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, প্রথম পাতা) শাহ্‌বাগ-আন্দোলন কোনো একক সংগঠন নয় আসলে। এটা হচ্ছে সংগঠনসমূহের সংগঠন। আন্দোলনসমূহের আন্দোলন। অকুপাই-আন্দোলনের মতো। বৈশ্বিক ন্যায়বিচার-আন্দোলনের মতো। সিয়াটল-জেনোয়ার কর্পোরেট বিশ্বায়নবিরোধী আন্দোলনের মতো। ঐসব আন্দোলনের মতোই শাহ্‌বাগ-আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামোও অতিশয় শিথিল, বৈচিত্র্যশীল এবং বহুবিধ চিন্তা -মতামত-ধ্যানধারণার প্রতিনিধিত্বকারী।

শৈথিল্যে এবং বৈচিত্র্যেই শাহবাগ-আন্দোলনের শক্তি। কঠোরতা এবং বাধ্য-বাধকতা এবং হুকুমতান্ত্রিক অনুশীলনে এর দুর্বলতা। সৌভাগ্যবশত এ আন্দোলন এতই বহুধারা-ঋদ্ধ ও বৈচিত্র্যমুখর যে প্রচলিত কর্তৃত্বপরায়ন ঘরানার কোনো কঠোর বাধ্যবাধকতাপূর্ণ হুকুমতান্ত্রিক 'শৃঙ্খলা'র অনুশীলন এ আন্দোলনে গড়েই উঠতে পারে নি। কখনোই না। সামান্যও না। শুরুতে না, পূর্ণ জোয়ারের সময় না, ভাটার টানেও না। তার মানে এই নয় যে ঐ জাতীয় কঠোর বাধ্যবাধকতাপূর্ণ হুকুমতন্ত্র কায়েমের কোনো আকাঙ্ক্ষা এই শাহবাগ-আন্দোলনের তথাকথিত কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ছিল না। থাকারই কথা। এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশের ডান-বাম-উত্তম-মধ্যম যাবতীয় দল-সংগঠনই মনে করে ঐক্যেই শক্তি। আর ঐক্য মানেই চিন্তা-কর্ম-সৃজন-শীলতার দিক থেকে বৈচিত্র্যহীন কঠোর ঐক্য। এঁদের কাছে ঐক্য মানে চিন্তার ঐক্য কথার ঐক্য কাজের ঐক্য। বলশেভিক ঘরানার পার্টিগুলোর মতো, এঁদের কাছে ঐক্য মানে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা-অনুসন্ধিৎসাবিহীন চিন্তাপ্যারেডের লেফটরাইট। হুকুমদার নেতারা 'সঠিক' সিদ্ধান্ত দেবেন আর 'ঐক্যবদ্ধ' অচিন্তাবাহিনী সেই সিদ্ধান্ত বাস্বায়ন করার জন্য নানা প্রকারের কৌতূহলশূন্য প্যারেড করতে থাকবে। 'মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী' অথবা 'হয় বিপ্লব না হয় মৃত্যু' মার্কা নানাবিধ প্যারেড। শাহবাগ এক মুহূর্তের জন্যও এরকম প্যারেডগ্রাউন্ডে পরিণত হয় নি। সেরকম সামান্যতম ইশারাও এতে ছিল না। এ থেকেই বোঝা যায় শাহবাগ অভিমান করে ফিরে উদ্যানের ভেতরে। সুতরাং, এই প্রবন্ধের পরিভাষায়, কেন্দ্রীয় গণজাগরণ-মঞ্চ-কমিটি হচ্ছে 'গণ-জাগরণ-মঞ্চ', আর সারা দেশের সারা বিশ্বের গণজাগরণ-মঞ্চসহ অজস্র ব্যক্তি-দল-গোষ্ঠী-মানুষ-ধারার যে বিপুলপ্রবাহ সেটিরই ডাক নাম গণজাগরণ-আন্দোলন ওরফে 'শাহবাগ-আন্দোলন'।

এই পার্থক্য জরুরি। শাহবাগ-আন্দোলনে পরিষ্কার দেখা গেছে, আন্দোলনের মাথার ওপর চেপে বসা আমলাতান্ত্রিক ও আনুষ্ঠানিক কমিটি নেতৃত্ব-কাঠামো এক জিনিস, আর এর মাঠ পর্যায়ের আপাত-নিরাকার, বহুমুখী, বহুবিচিত্র, অজস্র-অন্তপ্রাণ, স্বতঃস্ফূর্ত কর্মী-সংগঠকরা অন্য জিনিস। শাহবাগ-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এর স্বনির্ভরতা, আত্মসংগঠন, আনুভূমিক নেটওয়ার্কিং। কেন্দ্র-প্রান্ত কর্তৃত্বতন্ত্র বা হায়ারার্কি এর বৈশিষ্ট্য নয়। এখানে মানুষ অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে আসেন নি। সংকীর্ণ ব্যক্তি-দলীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য আসেন নি আমজনগণ।

অন্য দিকে গণজাগরণ-মঞ্চ নামক কমিটিখানার বৈশিষ্ট্য বলতে গেলে ডিক্রি-ফরমান-ফতোয়া-ঘোষণা-দাবিনামা। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এখানে কেন্দ্রে। অন্যদের কাজ স্রেফ 'কেন্দ্রীয়' কর্মসূচী অনুসরণ করা। প্রকৃতপক্ষে, শাহবাগ-গণজোয়ারের এ সাইডে দাঁড়িয়ে নিজেকে শাহবাগ-আন্দোলনের স্রষ্টা-প্রতিভূ-কাণ্ডারি বলে দাবি করে চলেছে বিশেষ ধারার রাজনৈতিক মুরুব্বিদের পছন্দের একটা

কমিটি। মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বিদের ভোট-ক্ষমতা-রাজনীতির সংকীর্ণ হিসাবনিকাশ ব্যাহত করেছে মাঠ পর্যায়ের আমপাবলিকের সর্বমুখীন স্বরাজকে। বিঘ্নিত হয়েছে খোদ শাহবাগ-আন্দোলনের স্বতস্ফূর্ত গতিধারা।

শাহবাগ-আন্দোলনের দিকে তাকালে পরিষ্কার দেখতে যাওয়া যাবে: এর মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বি-কমিটি এগিয়েছেন রাজনৈতিক যোগোযোগের বাহন মূলধারার মিডিয়ার আশ্রয়ের দিকে। আর শাহবাগের মাঠের আন্দোলন আগাগোড়াই থেকে গেছে ফেসবুক-সেলফোন-মুখোমুখি লেনদেনের সামাজিক যোগাযোগের আশ্রয়ে। যত দিন গেছে, মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বি-কমিটির সহায় হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক মিডিয়া।

খেয়াল করার মতো ঘটনা হলো: রাজনৈতিক মিডিয়া মাত্রেই কর্পোরেট মিডিয়া। বৃহৎ পুঁজির মিডিয়া। তথাকথিত 'নিওলিবারাল মুক্তবাজার' ওরফে কাছাখোলা-পুঁজিবাদের কারখানা-উৎপাদনবিমুখ আমদানি-রপ্তানি-ব্যাংক-বীমা-শেয়ার-বাজারনির্ভর ফটকা পুঁজিবাদের ধ্বজাধ্বারী সুশীল সমাজের এই মিডিয়ার নিজস্ব আর্থরাজনৈতিক কর্মসূচি। আছে গণস্বার্থবিরোধী এনজিও-চরিত্র। এরা রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা করলেও নিজেরা অরাজনৈতিক (অর্থাৎ সামাজিক) স্বার্থের সংরক্ষক নন। এরা সব গণবিরোধী বিদেশী দাতাসংস্থার, বিদেশী মাল্টিন্যাশনাল অর্থনৈতিক দানবের স্থানীয় এজেন্ট মাত্র। এদের প্রায় দুই দশকের (মূলত ১৯৯০ থেকে ২০০৭ সময়পর্বের) বিপুল প্রচারণাযজ্ঞের কল্যাণেই এদেশ বাস্তবায়িত হতে পেরেছিল মহাকুখ্যাত এক-এগারোর সুশীল-সামরিক জরুরি বিভীষিকা। এরাই ভর করেছিল শাহবাগ-আন্দোলনের নেতৃত্বের ওপর – প্রচ্ছন্নে, সমর্থনকারী বন্ধুর বেশে। শাহবাগ-আন্দোলনকে এগিয়ে দেওয়ার নামে এদের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল আন্দোলনটার বৈপ্লবিক রূপান্তরধর্মী চরিত্রকে যথাসম্ভব খর্ব করা। এটাকে স্রেফ একটা ফাঁসি-আন্দোলনে অধঃপতিত করা। এর লক্ষ্য ছিল এমনভাবে শাহবাগ-আন্দোলের ইমেজ তৈরি করা যাতে করে সত্যিকারের সমাজ-রূপান্তরের প্রশ্নগুলোকে সামনে আনতে না-পারে শাহবাগ। আর ঠিক এই প্রশ্নে এঁদের স্বার্থের সাথে মিলে গিয়েছিল ছোটবড় কতিপয় রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা কুক্ষীগত করার স্বার্থটি। পার্টি-পলিটিক্সের চিরাচরিত ধারায় এরা করেছেন শুধু ভোটের রাজনীতির হিসাবনিকাশ। এইসব শক্তির সর্বাঙ্গীন কৃত্রিম, লাগাতার, একমুখিন প্রচারণা অযুত মানুষের অজস্রমুখীন আন্দোলনের 'মুখপাত্র' হিসেবে একজন মাত্র ব্যক্তিকে একচ্ছত্র নেতা বলে প্রতিষ্ঠা করে ছেড়েছে। শাহবাগ-আন্দোলনের কাঁধে চেপে বসা মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বি-মুখপাত্র-কমিটি গজদন্ত-মিনারে বসে ঘোষণা করে গেছেন একের পর কর্মসূচী।

মাঠপর্যায়ের আন্দোলনের সূত্রপাত ও চটজলদি বিকাশ ঘটেছে সামাজিক মিডিয়াকে আশ্রয় করে। সামাজিক মিডিয়া বিকেন্দ্রায়িত। এই মিডিয়ার কোনো

একক কেন্দ্র থাকে না। এই মিডিয়ার কোনো একচ্ছত্র সর্বমান্য ‘পার্টিলাইন’ থাকে না। এর মোদ্দা বৈশিষ্ট্য বহুমত-বহুপথের শতফুল-শতধারা। এর অন্তর্গত-অন্তর্জাত-অন্তসলিলা-অলিখিত মূল নীতি হলো ‘শত ফুল ফুটুক, শত মত বিকশিত হোক’। এর মূল বৈশিষ্ট্য একের সাথে একের আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ। এ বস্তু সদাজীবন্ত, সদাপ্রাণ-চঞ্চল। এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো একক কেন্দ্র থাকে না। শাহবাগ-আন্দোলন সূত্রপাতের দিনটিতে এইসব বৈশিষ্ট্য ভাস্বর হয়ে হয়ে উঠেছিল শাহবাগে। বহুবছর ধরে নাটক-গান-কবিতা-রাজনীতি-সাহিত্য-সিনেমা-জগতের অজস্র কর্মী-সংগঠক-ব্যক্তির অজস্রমুখী কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে শাহবাগ নামক ভৌগোলিক জায়গাটাতে বাংলাদেশের নতুন সংস্কৃতির যে মুক্তাঞ্চলটা গড়ে উঠেছে তিল তিল করে তার মহাবৈচিত্র্যশীলতার মধ্যে স্বনির্মিত স্বভাটাই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল পরবর্তী কালের শাহবাগ-আন্দোলনের প্রথম দিনগুলিতে। শাহবাগের গড়ন-কাঠামোর এই আদি শনাক্তকরণ চিহ্নটাকে ক্রমাগতভাবে নস্যাৎ করেছে ‘গণজাগরণ মঞ্চ’ নামে পরিচিত হয়ে ওঠা একক-কেন্দ্রের দাবিদার আমলাতান্ত্রিক কমিটি-কাঠামোটি। যত বেশি এই কেন্দ্রায়ন প্রক্রিয়াটি শক্তি সঞ্চয় করেছে তত বেশি করে সরে গেছেন এর মাঠপর্যায়ের কর্মী-সংগঠকেরা। কিন্তু ভৌগোলিক ও মানসিক শাহবাগ এবং তার আশেপাশেই রয়ে গেছেন তাঁরা এখনও – নতুনতর আনুভূমিক গণজাগরণের অপেক্ষায়।

আপাতত নতুনতর পর্যায়ের নবজাগরণের পথে প্রধান বাধা হয়ে আছেন কর্পোরেট-মিডিয়া-নির্ভর, সরকারী সাহায্য-পাহারা-প্রটোকলনির্ভর ‘নাই-হয়ে-যাওয়া আন্দোলন’-এর মঞ্চ-মাইক-মুখপাত্র-মুরুব্বিরা। অপর প্রধান বাধা স্বনির্ভর, স্বতন্ত্র, স্বপরিচালিত, গণআন্দোলন গড়ার ক্ষেত্রে শাহবাগ-সংগঠকদের অভিজ্ঞতার অভাব। অন্যদিকে তথাকথিত ডানবাম-মিল্লাতবামওয়ালাদেরকেও শিখতে হবে মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বি-মুখপাত্র মার্কা সংগঠন-কাঠামোটাই বর্ষার মতো অবারিত, বসন্তের মতো আলো-ঝলমলে সত্যিকারের গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথে বাধা – তা সেই সংগঠন-কাঠামো ডান-বাম-উত্তম-মধ্যম যে রাজনৈতিক দলের হাতেই থাক না কেন তা থাকবে জনবিচ্ছিন্ন ওপরতলাতেই বন্দি। অন্য যেকোনো রাজনৈতিক দলের মতোই। রাজনৈতিক দল মানেই তো, আমি রাখাল তোমরা ভেড়ার পাল। রাখালের হাতে ভেড়ার পালের মুক্ত নাই এ কথা বুঝতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

গণজাগরণ-মঞ্চের কাঠামোটাই তৈরি হয়েছে পঞ্চ ম’য়ের পাঁচ খুটিতে। এই মঞ্চ ম হলো: মঞ্চ মাইক মুখপাত্র মুরুব্বি মিডিয়া। এই পাঁচ ম’য়ের একটা ম-ও মাটিতে প্রোথিত নয়। সবগুলোই লালিত-চর্চিত হয় ক্ষমতার ম ম গন্ধে। এই পঞ্চ ম আসলে যাবতীয় কেন্দ্রীভূত ক্ষমতারই পাঁচ খুটি। এ ছাড়া ক্ষমতা চলে না, ক্ষমতা বাঁচে না –

ছোট ক্ষমতা বড় ক্ষমতা, খুচরা ক্ষমতা রাক্ষস ক্ষমতা – সকল প্রকার ক্ষমতা-রাজনীতির অভ্যন্তরীন গড়ন এই পঞ্চ ম নিয়ে। পঞ্চ ম থেকে সাবধান। এ পঞ্চ ম সনাতন-সদাতন-সুমহান তন্ত্রের পঞ্চ ম নয় যে! এ হলো পঞ্চ মায়া। মায়া মানে সেই অলিক উপবোধ যা আমাকে পথ দেখতে দেয় না। নিজের পথে নিজেকে নিজের মতো করে হাঁটতে দেয় না। যেকোনো প্রকৃত গণআন্দোলনের পথে পথে পদে পদে আমাদেরকে পথচ্যুত করে এই পঞ্চ ম। সারা পৃথিবীর ইতিহাস তা-ই বলে। বিশেষত বাংলার ইতিহাস। 'গণজাগরণ-মঞ্চ' এবং এর কমিটির সদস্যদের নিয়ে আমার সামান্যও বিরাগ নাই। এঁরা প্রত্যেকেই বিবিধ ঝুঁকি নিয়ে, আন্তরিকতা নিয়ে, পুরো দেহমন নিয়ে এই আন্দোলনে যা করা সঠিক বলে মনে করেছেন তা-ই করেছেন, করে চলেছেন। এই মঞ্চ শাহবাগ-আন্দোলনের ঐতিহাসিক অংশ বৈকি। মুশকিল এই মঞ্চের বিচার-ব্রতী ব্যক্তিদেরকে নিয়ে নয় মোটেও। একে অস্বীকার করার কোনোই উপায় নেই। অস্বীকারের উপায় তো নেই-ই, বরঞ্চ এর উপযুক্ত নির্মোহ পর্যালোচনার ভেতরেই আছে শাহবাগ-আন্দোলনকে দ্বিতীয় পর্যায়ের নবজাগরণের দিকে নিয়ে যেতে পারার অন্যতম চাবিকাঠি।

এই জন্যেই মঞ্চ নিয়ে আলাপ। কী ধরনের মঞ্চ আমরা চাই? যে মঞ্চ উঁচুতে মাথায় করে রাখবে আমলাতান্ত্রিক-কমিটি-নেতাদেরকে আর নিচুতে মাটিতে বসিয়ে রাখবে পিপড়ার সারির মতো অগণিত আমজনতাকে? নাকি আমরা মঞ্চ বলতে এমন কোনো প্লাটফর্মের ধারণাকে বুঝব যে প্লাটফর্ম প্রকৃতপক্ষে একটা বিশাল পাটাতনের মতো সমস্ত দল-শক্তি-ব্যক্তির সমমর্যাদাপূর্ণ সমাবেশ ঘটাবে? আলাপটা তাহলে সংগঠনের। কেননা নেতৃত্বকাঠামো নিয়ে আলাপ মানে সংগঠনকাঠামো নিয়ে আলাপ। আলাপটা উপায়ের। উপায়ের সাথের উদ্দেশ্যের সঙ্গতির। আমাদের উদ্দেশ্য যদি হয় উন্নত বাংলাদেশ রচনার জন্য মাটি তৈরি করা, তাহলে তো আমরা অনুন্নত ও বিষাক্ত রাসায়নিক উপায়ে জমি রচনা করতে পারব না। তাহলে সেটা বিষাক্ত বাংলাদেশের দিকে নিয়ে যাবে আমাদেরকে। নিয়ে যাবে অনুন্নত বাংলাদেশের দিকে। যদিও আমরা – আন্তরিকতার সাথে – চেয়েছিলাম উন্নত বাংলাদেশে পোঁছাতে। আলাপটা তাহলে মঞ্জিলে মোকামের সাথে পথের সঙ্গতির।

সমস্যাটা তথাকথিত নেতাদের আন্তরিকতার নয়, সমস্যাটা সংগঠন-পরিচালনাগত উপায়-প্রণালীর। সচিবালয় থেকে সংসদ থেকে বেসরকারী সংস্থা থেকে পাড়ার ক্লাব পর্যন্ত সমস্ত কিমিটর সমস্ত নেতাই তো আন্তরিক! আন্তরিকভাবে এটাসেটা করে তাঁরা 'নেতা' হয়ে উঠতে চান, আর বাদবাকি সব্বলকে বানাতে চান 'কর্মী'। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় আজীবন কমিউনিস্ট পার্টি করা এই আমরা আর আমাদের বন্ধুরাই খোদ পার্টির মধ্যে এরকম আমলা-কামলা বিভাজন দেখেছিলাম। তা নিয়ে কটাক্ষ করেছিলাম। আসলে আমাদের সকল প্রকার

পলিটিক্যাল পার্টি এবং দল-মত-সংস্থা-সংগঠনই এই বিভাজনের ওপর দাঁড়ানো। কয়েক হাজার বছরের হুকুমতন্ত্রের আর কর্তৃত্বতন্ত্রের সাধনা আমাদেরকে হয় দাস না হয় তো দাস-মালিক হওয়ার দিকে ঠেলে দেয়। আমাদের আজীবনের আদতে সামরিক দীক্ষায়নের সমাজ-রাজনীতি-প্রশিক্ষণ আমাদেরকে এ বস্তুটিকে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক বস্তু বলে প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নিতে শেখায়। আর যে প্রশ্ন তোলে, নিজের মতো করে পথ খুঁজতে চায়, সকল মানুষের সমমর্যাদার স্বাভাবিক সত্যে বিশ্বাস করে তাকে উপাধি দেয় 'বেয়াদব'। কর্তৃত্বগিরির দূষিত বাতাসে আক্রান্ত পরিবার-বিদ্যালয় -প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছ থেকে সযত্নে লুকিয়ে রাখে এই সত্য যে মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস এক অর্থে বেয়াদবিরই ইতিহাস। (যেমন ধরুন গ্যালিলিওর চেয়ে বড় বেয়াদব কে ছিলেন?)

তো সমস্যাটা তাহলে আন্তরিকতার নয়। আমাদের পরিচিত মৌমাছির উপনিবেশগুলোতে 'রাণী-মৌমাছি' যেমন আন্তরিক, 'দাস-মৌমাছি'ও তেমনই আন্তরিক। এ বটে আন্তরিক দাসপ্রথা – মানতেই হবে। কিন্তু এও আমাদের জানা থাকা দরকার যে দাসত্ব-রাজত্বের প্রচল-প্রণালী মৌমাছি-জাতির জন্য প্রাকৃতিক বাধ্যতা নয়, চিরস্থায়ী নিয়তি নয়। এমন অনেক মৌমাছি-প্রজাতি আছেন যাঁরা দাসতন্ত্র-রাজতন্ত্রের সীমার বাইরে পথ খোঁজেন*। তাহলে মানুষের জেনেটিক গড়নটা যে নিয়তিগতভাবে আন্তরিক পরাধীনতা-প্রথার নয় সে প্রশ্নে কি আমাদের কোনো দ্বিধা আছে? শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত অর্থে পূর্বনির্ধারিত, চির-অনতিক্রম্য নিয়তি বলে কিছু নাই। আমরা এবং মৌমাছিরা চাইলে নেজেদের মতো করে পথ খুঁজতে পারি, খোঁজার কথা ভাবতে পারি। স্রেফ এই ভাবনাটুকু পর্যন্ত আমাদের জিন-কোষে সঞ্চিত হয়ে বিদ্যমান অপরাজনীতি ও অপপ্রচারমাধ্যমের অপব্যবসায়ীরা সকলেই আন্তরিক। প্রতিটা খুনীই খুন করে আন্তরিকভাবে। না হলে সে ধরা পড়ে যাবে। সমস্যাটা তাই আন্তরিকতার নয়, যেনতেন প্রকারের যুক্তি-বৈধতা খাড়া করার নয়। সমস্যাটা উপায়-প্রণালী-পদ্ধতি-তরিকার। হাজার হাঁটাহাঁটি করলেও আমরা উড়তে পারব না। ওড়ার তরিকা আলাদা। তার জন্য ভিন্ন উপায়। যদি আমরা চাই সমাজকে জাগাতে তাহলে সমাজ-সংগঠনের বিন্যাস বদলাতে হবে। সামাজিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সমাজের অজস্র মানুষকে সমঅংশীদার করতে হবে। ভবিষ্যতের সমাজের মানুষদেরকে যদি আমি সক্ষম-সৃজনশীল-সংহতিপরায়ন দেখতে চাই, তাহলে তার জন্য আমাদেরকে এখন থেকেই সক্ষম-সৃজনশীল-সংহতিপরায়ন

---

* এ নিয়ে ইন্টারেস্টিং সমাজ-জীববৈজ্ঞানিক গবেষণা-আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে: অ্যান্ড্রু ব্যারন প্রমুখ, ২০০১; অ্যান্ড্রু ব্যারন এবং বেঞ্জামিন অলড্রয়েড, ২০০১; বি. পি. অলড্রয়েড প্রমুখ, ২০০১; ম্যাডেলিন বিকম্যান প্রমুখ, ২০০১; এবং ম্যাডেলিন বিকম্যান এবং বেঞ্জামিন অলড্রয়েড, ২০০১।

সংগঠনপ্রণালীতে চলার চেষ্টা করতে হবে। সক্ষম-সৃজনশীল-সংহতিপরায়ন ব্যক্তির বিকাশ ছাড়া তো আর সক্ষম-সৃজনশীল-সংহতিপরায়ন সমাজের বিকাশ ঘটবে না। এটা কাণ্ডজ্ঞান মাত্র।

তাহলে আমাদেরকে এমন সমাজ-সংগঠন-প্রণালীর কথা ভাবতে হবে যাতে করে ব্যক্তির ঐ ধরণের বিকাশ ঘটতে শুরু করে এখন থেকেই। এখন আমি চাইব ব্যক্তিরা সব আনুগত্যপরায়ন, পদলেহী, অপ্রশ্ন-অনুসারী হয়ে চলুক কেননা এখন পরিস্থিতি ভালো না, আর ভাবব ভবিষ্যতে পরিস্থিতি ভালো হলে ব্যক্তি-মানুষরা সব স্বনির্ভর, আত্মমর্যাদাপ্রবণ, সপ্রশ্ন-পথাভিসারী হয়ে উঠবে তাহলে হয় আমরা আত্মঘাতী প্রক্রিয়া নিয়োজিত আছি, না হয় তো আসলে আমি কর্তৃত্বপরায়ন একটা গড্ডলপ্রবাহিত সমাজের কথাই ভাবছি আসলে যে সমাজে ভালো মানুষ বলতে বোঝাবে অনুগত, অনুসারী, বিনাপ্রশ্নে-মেনে-চলা মানুষ যে লেফটরাইট করা ছাড়া আর তেমন কিছু করবে না। আর শ্রেষ্ঠ মানুষ বলতে বোঝাবে এমন মানুষ যাঁরা দক্ষ হাতে অন্য মানুষদের পিপিলীকা-প্রবাহকে পরিচালনা করতে সক্ষম। কিন্তু সৈনিকের মতো সারিবদ্ধ মানুষ কিংবা সেনাপতির মতো হুকুমদার মানুষ উন্নত-সক্ষম-সৃজনশীল-স্বাধীন-সংহতিপরায়ন ব্যক্তি-মানুষের মঙ্গলময় নজির নন।

বন্ধু ফারুক ওয়াসিফ এক্কেবারে ঠিক কথাটা টুকে রেখেছিলেন: শাহবাগ-আন্দোলনের ছিলেন একটাই ইমাম – শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। সেই ইমাম মঞ্চ-মাইক-মুখপাত্রদের মতো মিডিয়া-মুরুব্বি বেষ্টিত কৃত্রিম ইমাম নন। নিকষ অন্ধকার স্রেফ নিজের আত্মার আগুন জ্বেলে পথ খোঁজার অভিযাত্রী-অগ্রপথিক নেতা*। এ নেতা ন্যাচারাল লিডার। আমলাতান্ত্রিক কমিটির নেতা নন তিনি। এ নেতা একাত্তর-পূর্ববর্তী বাংলাদেশের অবিসম্বাদিত অগ্রপথিক শেখ মুজিবর রহমানের মতো নেতা। গোটা দেশের মানুষ যার সাথে সাথে হাঁটতে পারেন নিশ্চিন্তে। অনায়াসে। সহযাত্রীর মতো। বঙ্গবন্ধু বা শহীদ জননী আর আসবেন না। আমাদেরই প্রত্যেককে হয়ে উঠতে হবে একেক জন ন্যাচারাল লিডার।

আমরা ঠিকমতো চাইলে আবারও জেগে উঠতে পারে শাহবাগ-আন্দোলন

বাস্তবকে স্বীকার করার মতো সাহস থাকতে হবে আমাদের। আমাদের শাহবাগ-আন্দোলন হারিয়ে গেছে। হ্যাঁ, স্বীকার করতে আজ দ্বিধা নেই – কোকিল চলে গেছে। কিন্তু এ-ও তো সত্য যে থেকে গেছে তার মধুর যুগান্তর-ধ্বনি, কালান্তরের আওয়াজ। ফিরে আসবে আসবে শাহবাগ। যদি আমরা আবার তাকে ডেকে আনতে

---

* নেতা = যিনি নীতিপথে হাঁটেন। কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী প্রণীত বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ।

পারি। ডাকতে পারি বুঝেশুনে। নিশিরাতের সত্যিকারের স্বপনে সে প্রাণকোকিলার গান যাঁরা এখনও শুনতে পাচ্ছেন তাঁরা আবার সমবেত হবেন বৈকি। নতুন প্রস্তুতি নিয়ে। আরো বেশি আনন্দ নিয়ে। ব্যর্থতাই সাফল্যের চাবিকাঠি। কেন আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম তা যদি আমরা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করতে পারি, শুধুমাত্র তাহলেই সেসব সীমাবদ্ধতার উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। আর কোনো উপায় নাই।

আমাদেরকে বুঝতে হবে: সরকারী স্পন্সরশিপে গণআন্দোলন হয় না। ফটোজেনিক-মিডিয়াজেনিক শোবিজ হয় বড় জোর। স্রেফ সমালোচনা-পর্যালোচনা দিয়েও গণআন্দোলন হয় না। তার জন্য লাগে উপযুক্ত, স্বাধীনতাশীল সংগঠন-প্রণালী। উপযুক্ত সংগঠন-প্রণালী থাকলে সমালোচনা-পর্যালোচনা-প্রকাশনা বদলে দিতে পারে ক্ষমতাওয়ালাদের ছককষা হিসেবনিকেশ। নেতৃত্বের একক কেন্দ্র বানাতে গেলে ভণ্ডুল হয় যায় সব। বহুস্বর, বহুমত, বহুকেন্দ্রই হবে আগামী দিনের গণআন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শতকেন্দ্রী শতধারার আন্দোলন লাগবে আমাদের যদি আমরা জনসমুদ্র রচনা করতে চাই পুনরায়। শাহবাগ-সমাবেশকে শিখতে হবে অকুপাই থেকে। নতুন ধারার আন্দোলনের জন্য চাই নতুন ধারার সংগঠন কাঠামো। স্বাধীন ও আত্মনির্ভর আত্মসংগঠন গড়া শিখতে হবে। এ ধরনের সংগঠনই গত দুই দশক জুড়ে বৈশ্বিক ন্যায়বিচার আন্দোলন, কর্পোরেট বিশ্বায়নবিরোধী আন্দোলন, সিয়াটলের আন্দোলন, অকুপাই-মহাআন্দোলনের মতো আন্দোলনগুলো গড়ে তুলতে পেরেছে। এগুলোকে বলে আন্দোলনসমূহের আন্দোলন – মুভমেন্ট অফ মুভমেন্টস। এসব আন্দোলনের বটবৃক্ষের তৃণমূলে থাকে ৫ থেকে ১৫/২০ জনের একেকটা স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বপরিচালিত কোষ-সংগঠন। এইসব কোষ-সংগঠনের গঠনপ্রণালী নিয়ে আমি শাহবাগ-জাগরণের ভরা জোয়ারের দিনগুলোতে আলোচনা করেছি। এখান তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবো না। এরকম অজস্র সংগঠনের শত-হাজারটা নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলে বিকেন্দ্রায়িত সামাজিক শক্তির বিশালকায় জৈব শক্তি। এ জিনিস এস্তেমাল করার জন্য সারাদেশে শত শত ওয়ার্কশপ-আড্ডায় বসতে হবে আমাদেরকে। পড়তে হবে, বলতে হবে, ভিডিও দেখতে হবে। পরস্পরের কাছ থেকে হবে শিখতে।

শাহবাগ-আন্দোলনের প্রকৃত প্রাণপ্রবাহ স্বাধীনতার পথে। শাহবাগের স্বাধীনতাই শাহবাগের পথ। শাহবাগ-আন্দোলনের স্বাধীনতার স্পৃহাই আমাদের মুক্তির রাস্তা। এই মুক্তির কোনো শর্টকাট নাই। যাবতীয় নেতা-খেতা-হুজুর-বৈজ্ঞানিক-রাজবুদ্ধি-জীবীদের আইন-কানুন-নির্দেশনা ও মুরুব্বিগিরির বাইরে এসে যদি আমরা স্ব-উদ্যোগে, স্ব-অধীনভাবে, স্ব-ইচ্ছায়, পৃথক পৃথক সত্তা-পরিচয় বজায় রেখে সক্কলে মিলে একটা আমব্রেলা-আন্দোলন-সংস্থা গড়ে তুলতে পারি পুনরুজ্জীবন ঘটবে শাহবাগের। আমরা যদি স্বাধীনতার যোগ্য হয়ে উঠি তবেই আমরা শাহবাগ-

আন্দোলনের সুপ্ত-প্রচ্ছন্ন আত্মাকে আবার জাগিয়ে তুলতে পারব, দিই দিন আগে কিংবা পরে। মুক্তি কখনও আপনাআপনি আসে না। একদিন সত্যের ভোর আসবেই বলে গান গাইলেই সত্যের ভোর আসে না। দেশব্যাপী নিবিড়, দীর্ঘমেয়াদী সাংগঠনিক কাজ করতে হয় অনেক মানুষকে। সেকাজে আমরা যদি ব্যর্থ হই তাহলে শাহবাগ-আন্দোলন স্থায়ী একটি জাদুঘর-মঞ্চে পরিণত হবে। গুটিকতক রাজাকারের ফাঁসি শেষে সেই মঞ্চ বাড়ি ফিরবে খালি হাতে ফাঁসির দড়াদড়ি ঘাড়ে নিয়ে। কেউ কেউ মন্ত্রীত্বের মালাও পাবেন হয়ত দুই দিন আগে কিংবা পরে। বাংলাদেশের মানুষকে তখনও তার মুক্তির পথ খুঁজে যেতে হবে। প্রজন্মান্তরে। নবতর সেই প্রজন্মের জন্য শাহবাগ রেখে গেছে অজস্র কবিতা-গান-চিত্রকলা-নাটক-কারুকার্য। সে রকম একটা কবিতায় যে রাজনৈতিক রূপকল্প মূর্ত হয়ে উঠেছে অকুপাই-আন্দোলনের ধারায় তা শুধু অনাগত প্রজন্মের জন্যই বা শুধু কেন সামনের দিনগুলোর যেকোনো দিনে আবৃত্তি করে উঠতে পারে যে ধরণের কবিতা তা পড়ে শোনানোর মধ্য দিয়ে শেষ করব এই আলোচনা:

আমি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ –
তোমরা সংসদ ছেড়ে চলে যাও।
আমি গাইবান্ধার জলো বিল থেকে এসেছি-এই দ্যাখো আমার পায়ে কাঁদা।
আমি বরিশালের কীর্তনখোলা এসেছি-এই দ্যাখো আমার হাতে বৈঠা।
আমি দিনাজপুরের ধান ক্ষেত থেকে এসেছি-এই দ্যাখো আমার হাতে কাস্তে।
আমি কানছাটের মিছিল থেকে এসেছি-এই দ্যাখো আমার চোখে আগুন।
আমি চিলমারি, ভবদহ, নড়াইল, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, রাঙ্গামাটি, জয়পুরহাট,
শ্যামনগর, মৌলভিবাজার, লাঙ্গলবন্দ থেকে এসেছি
আমি সমগ্র বাংলাদেশ থেকে এসেছি।

তোমরা এখনই, এই মুহূর্তে, অনতিবিলম্বে –
আবাসিক এলাকা, ক্যান্টনমেন্ট, সেক্রেটারিয়েট, বিশ্ববিদ্যালয়,
খাদ্যের গুদাম, অস্ত্র-কারখানা, হাইকোর্ট, ব্যাংক, শপিংমল
উদ্যান, উপাসনালয় ছেড়ে পালিয়ে যাও।
আমি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ –
তোমরা সংসদ ছেড়ে চলে যাও।

কোনো দাবি-দাওয়া নয়
বৈঠক নয়
সংলাপ নয়

স্মারকলিপি নয়
করমর্দন নয় –

পরাজিত হবার পর শত্রু যেভাবে হাত উচু করে থাকে
সেইভাবে
ধরা পড়ার পর চোর যেভাবে মাথা নিচু করে থাকে
সেইভাবে
সহসা আবির্ভূত ক্ষিপ্র চিল দেখে ইদুর যেভাবে ছুটে পালায়
ঠিক সেইভাবে
তোমরা সবকিছু ছেড়ে পালিয়ে যাও।
তোমরা সংসদ ছেড়ে চলে যাও।

তোমাদের ফ্রিজ, কালার টিভি দাও
আমার চাল-ডাল লাগবে।
তোমাদের ওয়ার্ডরোব, সোফাসেট দাও
আমার কাপড় লাগবে।
তোমাদের কসমেটিক্স, পারফিউম দাও
আমার ওষুধ লাগবে।
তোমাদের হেগেল, রবীন্দ্রনাথ দাও
আমার বর্ণ পরিচয় লাগবে।
তোমাদের অস্ত্র গুলো দাও
আমার কোদাল,শাবল লাগবে।
তোমাদের মন্ত্রণালয়গুলো দাও
আমার গোয়াল লাগবে।
তোমাদের সংবিধানের কাগজগুলো দাও
আমার শৌচাগারে লাগবে।

আমি উড়ে এসে জুড়ে বসিনি।
তোমাদের আর্য-স্পর্ধার আগে কয়েক সহস্রবার আমি জন্মেছি এখানে।
অশোকের তাম্র-শাসনের সময় আমি ছিলাম একজন ছুতোর মিস্ত্রি।
বঙ্গ-পুন্ড্র-বরেন্দ্র-সমতট-হরিকেল যুগপতভাবে আমার রক্তে প্রবাহিত।
চর্যাপদের বাদামী পাতাগুলো আমার বাড়ির তাতে বানানো।
বখতিয়ারের ঘোড়া ছুটে গিয়েছিল আমার ক্ষেতের উপর দিয়ে।
তেভাগার ঘাঁ এই দ্যাখো এখনো লেগে আছে আমার হাঁটুতে।

তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজের কামানের গোলা এসে লেগেছিল
আমার পাঁজরে।
আমি এখনো সোজা হয়ে দাড়াতে পারিনি।
আমি উড়ে এসে জুড়ে বসিনি।

তোমরা এখনই, এই মুহূর্তে, অনতিবিলম্বে –
সংসদ ছেড়ে চলে যাও।

কোনো দাবি-দাওয়া নয়
বৈঠক নয়
সংলাপ নয়
স্মারকলিপি নয়
করমর্দন নয় –

পরাজিত হবার পর শত্রু যেভাবে হাত উচু করে থাকে
সেইভাবে
ধরা পড়ার পর চোর যেভাবে মাথা নিচু করে থাকে
সেইভাবে
সহসা আবির্ভূত ক্ষিপ্র চিল দেখে ইদুর যেভাবে ছুটে পালায়
ঠিক সেইভাবে
তোমরা পালিয়ে যাও।

তোমরা ব্যঞ্জনা বোঝো
কথা বোঝো না?
বিমূর্ত বোঝো
আক্ষরিক বোঝো না?
প্রযুক্তি বোঝো
গননা বোঝো না?

আমি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ –
তোমরা সংসদ ছেড়ে চলে যাও।*

রাবি: ১৯শে জানুয়ারি ২০১৪

---

* জাহিদ আকতার। আমি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ – তোমরা সংসদ ছেড়ে চলে যাও। ২৬শে মার্চ ২০১৩

হদিস

অ্যান্ড্রু ব্যারন প্রমুখ, ২০০১। Andrew B. Barron, Benjamin P. Oldroyd and Francis L. W. Ratnieks (২০০১), “Worker Reproduction in Honey-Bees (Apis) and the Anarchic Syndrome: A Review”, *Behavioral Ecology and Sociobiology*, Vol. ৫০, No. ৩ (Aug., ২০০১), pp. ১৯৯-২০৮ (Published by: Springer), Stable URL: http://www.jstor.org/stable/৪৬০১৯৫৫, Accessed: ১৯/০১/২০১৪ ১০:২০.

অ্যান্ড্রু ব্যারন এবং বেঞ্জামিন অলড্রয়েড, ২০০১। Andrew B. Barron and Benjamin P. Oldroyd (২০০১), “Social Regulation of Ovary Activation in 'Anarchistic' Honey-Bees (Apis mellifera)”, Behavioral Ecology and Sociobiology, Vol. ৪৯, No. ২/৩ (Jan., ২০০১), pp. ২১৪-২১৯, (Published by: Springer), Stable URL: http://www.jstor.org/stable/৪৬০১৮৭৭, Accessed: ১৯/০১/২০১৪ ১০:২৯.

বি. পি. অলড্রয়েড প্রমুখ, ২০০১। B. P. Oldroyd, T. C. Wossler and F. L. W. Ratnieks (২০০১), “Regulation of Ovary Activation in Worker Honey-Bees (Apis mellifera): Larval Signal Production and Adult Response Thresholds Differ between Anarchistic and Wild-Type Bees”, *Behavioral Ecology and Sociobiology*, Vol. ৫০, No. ৪ (Sep., ২০০১), pp. ৩৬৬-৩৭০ (Published by: Springer), Stable URL: http://www.jstor.org/stable/৪৬০১৯৭৭, Accessed: ১৯/০১/২০১৪ ১০:৩০.

ম্যাডেলিন বিকম্যান প্রমুখ, ২০০১। Madeleine Beekman, Stephen J. Martin, Falko Drijfhout and Benjamin P. Oldroyd (২০০৭), “Higher removal rate of eggs laid by anarchistic queens—a cost of anarchy?”, *Behavioral Ecology and Sociobiology*, Vol. ৬১, No. ১২ (October ২০০৭), pp. ১৮৪৭-১৮৫৩ (Published by: Springer), Stable URL: http://www.jstor.org/stable/২৭৮২৩৫৭১, Accessed: ১৯/০১/২০১৪ ১০:২৮.

ম্যাডেলিন বিকম্যান এবং বেঞ্জামিন অলড্রয়েড, ২০০১। Madeleine Beekman and Benjamin P. Oldroyd (২০০৩), “Different Policing Rates of Eggs Laid by Queenright and Queenless Anarchistic Honey-Bee Workers (Apis mellifera L.)”, *Behavioral Ecology and Sociobiology*, Vol. ৫৪, No. ৫ (Sep., ২০০৩), pp. ৪৮০-৪৮৪ (Published by: Springer), Stable URL: http://www.jstor.org/stable/২৫০৬৩২৯৩, Accessed: ১৯/০১/২০১৪ ১০:২৯.

সেলিম রেজা নিউটন: রাবি'র গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক
www.salimrezanewton.com salimrezanewton@gmail.com